ভাঙা দেশের স্মৃতি ও শঙ্খ ঘোষের কবিতা

সিদ্ধার্থ সেন

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ইতিহাসের পাতায় একটি অবিনাশী তারিখ হয়ে থাকলেও মানবেতিহাসের পাতায় চিরকালীন একটি কালো দিন। অনেক মানুষের বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ওই দিনটিতে এলেও তার সঙ্গে চিরকালের জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িয়ে রয়েছে দেশভাগের কাঁটাতার, কাটা-ছেঁড়া মানবহৃদয়ের যন্ত্রণা আর অবিরল রক্তপাতের ইতিহাস। আগামী বছরেই দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫তম বর্ষ উদযাপিত হবে মহাসমারোহে কিন্তু অসংখ্য বাঙালির অন্তরালে লুকিয়ে-রাখা এই চিরকালীন ক্ষতস্থানটিকে কতজন বাঙালি অনুভব করবেন? স্বাধীনতাকে স্বার্থসিদ্ধির দাঁড়িপাল্লায় চাপিয়ে জাত-পাত, সম্প্রদায়ের নিরিখে তৎকালীন মাননীয় দেশনেতারা সকলের প্রিয় দেশটিকে টুকরো করার খেলায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন যার ফলে জন্ম নিয়েছিল একটাই দেশ ভেঙে দুটো দেশ--ভারত ও পাকিস্তান। এর ফলে ভিতরে ভিতরে এক সর্বগ্রাসী বিভাজন ঘটে গেল মানুষের জীবন, জীবিকা আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্যে, হৃদয়ধর্ম আর আচরিত ধর্মের মধ্যেও। বহু মানুষের শারীরিক ও মানসিক দুর্ভোগ, জীবনধারণের সংকট, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে বিচ্যুতি ও পরিচিতির সংকট যা দেশভাগের অভিজ্ঞতাকে একমাত্রিকতার সীমানায় আবদ্ধ থাকতে দেয় না চিরকালের জন্য। দেশভাগের রক্তাক্ত স্মৃতির চিহ্ন ধারণ করে এখনও অশীতিপর বহু মানুষ বেঁচে আছেন তাঁদের শৈশব-কৈশোরের কিছু স্মৃতি নিয়ে। যাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছে হঠাৎই এক নিমেষে 'স্বদেশ'-এর সংজ্ঞা বিরাট প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, রাতারাতি তা হয়ে উঠেছিল 'বিদেশ'। বিমূঢ়, বাস্তুচ্যুত অসংখ্য মানুষ পায়ে পায়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন চেনা মাটি, নদী-আকাশ, গাছপালা, প্রিয়জনকে ফেলে রেখে। অনিশ্চিত জীবনের ঠিকানা খুঁজতে-থাকা সেই মানুষগুলো ভেসে বেড়িয়েছেন শ্যাওলার মতো রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে উদ্বাস্তু শিবিরে, দণ্ডকারণ্য থেকে মরিচঝাঁপি, চম্পারন থেকে আন্দামান, সুন্দরবনসহ পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে। এই দেশবিভাজনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ অভিঘাত, তার নানামাত্রিক ছবি বাংলা সাহিত্যে স্বাভাবিক কারণেই পড়েছে কেন না সাহিত্য দেশ-কাল নিরপেক্ষ হতে পারে না। 'দেশভাগ' আর 'দেশত্যাগ' এই শব্দদুটি মিলেমিশে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে একথা আমরা ক'জন ভাবি?। চকিতে মনে পড়ে যেতে পারে কবি জীবনানন্দ দাশের সেই পংক্তিটি 'বাঙলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল' (কবিতা : '১৯৪৬-৪৭')--এখানে মানুষের বাসনার দেশটিকে বুকের মাঝে রেখে অনন্ত বিচ্ছেদের যন্ত্রণা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু মানবহৃদয় কাঁটাতারের সীমানাকে মনে মনে অস্বীকার করতেই চায়। কবি সুভাষ

মুখোপাধ্যায়ের বেপরোয়া কলম লেখে :

আমরা যেন বাংলাদেশের
চোখের দুটি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে--
থাকুক গে পাহারা।

দুয়ারে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা।
ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা।

কবি শঙ্খ ঘোষের জন্ম ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর মাতুলালয় ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুরে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান), পৈতৃক বাসস্থান বরিশাল জেলার বানরিপাড়া (বর্তমান বাংলাদেশ)। ১৯৪৭ সালে পাবনা জেলার পাকশি চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাপীঠ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৯-এ সেখান থেকেই আই.এ.পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি বৃত্তি পেয়ে বি.এ. শ্রেণিতে ভর্তি এবং ১৯৫১-তে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ সালে বাংলা এম.এ.পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরটিতেই তিনি পনেরো-ষোলো বছর বয়সে ওপার বাংলা ছেড়ে কলকাতা শহরে চলে আসেন। তাই দেশভাগের যন্ত্রণা উঠে আসে তাঁর নানা লেখায় বিছিন্ন টুকরো টুকরো স্মৃতিচারণায় যার সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে নস্টালজিক এক বিষণ্ণতা। পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে যাঁরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের সকলের মধ্যেই দেশভাগের যন্ত্রণা ব্যক্ত হয়েছে প্রত্যক্ষত নয়, কবিতায় স্মৃতির অনুসঙ্গে। পুরোনো এই দিনের কথায় যেন ব্যক্তিমানুষের অন্তরেরও কোনো চিরকালীন যোগ রয়ে যায়। শঙ্খ ঘোষের কোনো কোনো কবিতার শরীরে, ছড়ায়, কিশোর-উপন্যাসেও ঘুরে ফিরে এসেছে দেশভাগ, ছেড়ে-আসা গ্রাম, প্রকৃতি, নদী-খাল-বিল, উদ্বাস্তুজীবনের দুর্যোগ ও যন্ত্রণা, শিকড়হীনতার বেদনার কথা। এই কবি 'কবিতার মুহূর্ত' বলতে যা বোঝেন তাকে ব্যক্ত করেন এই ভাষায় : ' এইসব মুহূর্তই হলো অতীত ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের মিলনমুহূর্ত, নিমেষের মধ্যে সময়টাকে তখন ভাবীকালের দিকে সরিয়ে নিয়ে অতীত হিসেবে ভাবতে পারা যায়।' তাঁর লেখায় অতীত বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে,বর্তমানও হয়ে ওঠে ভবিষ্যতের অতীত--' এই 'কালের মাত্রা' তাঁর লেখাকে স্পর্শ করে থাকে। জীবনপথের ধুলোয় ধুলোয় ছড়িয়ে থাকে অতীত থেকে বর্তমানের নানা চিহ্ন যা চিরন্তনের সঙ্গে গিয়ে মেশে। দেশভাগ প্রসঙ্গকে তাঁর কবিতায় খুঁজে পাওয়ার নান্দীমুখ হিসেবে আমাদের গিয়ে দাঁড়াতে হয় তাঁরই লেখা দুটি কিশোর উপন্যাসের কাছে --'সকালবেলার আলো' (১৯৭২) ও 'সুপুরিবনের সারি' (১৯৯০) যে কাহিনির মূল কেন্দ্রে রয়েছে এক কিশোর, নাম নীলমাধব। মূলত এই উপন্যাস দুটির প্রেক্ষাপট পদ্মাপারের খোলা প্রকৃতির নদী-প্রান্তর-ছোটো জনপদ পাকশি আর বানরিপাড়ার কথা। পদ্মানদীও তার বিস্তীর্ণ রূপ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তাকে দেয় প্রকৃতিপাঠের প্রাথমিক শিক্ষা। সেই প্রিয় পরিবেশ ছেড়ে তাঁকে একদিন বাধ্যত চলে আসতে হয়েছিল, বাস্তুহীনতার সংশয়ে। আর পুনর্বাসনের সম্ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল কবির কিশোরমন। সেই মানসিকতার

প্রতিফলন মেলে শব্দের চেহারায় :

কী ছিল বয়স কী ছিল হৃদয়,তখন
পদ্মা আমাকে দিয়েছিল বিদায়---
আজ মনে জানি তুমি নও তুমি নও
আমিই আমাকে ছেড়েছি মাঝরাতে।
('একা' : "আদিম লতাগুল্মময়")

একি শুধু জন্মভূমি ছেড়ে আসা? নিজের শিকড়টিকে বাধ্য হয়ে উপড়ে নিয়ে আসা, যা নাড়ী ছিঁড়ে ফেলার সামিল। জীবনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "দিনগুলি রাতগুলি" কাব্যগ্রন্থেই ' স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে' নামের কবিতায় দেখি :

নদী তুমি? সে তোমারই শৈবালের আচ্ছাদনে ঢাকা
বেদনার ধারা চলে আসমুদ্রহিমাচল ক্ষীণ -
আমার হৃদয় তার দ্বীপে দ্বীপে পুঞ্জ করে তাকে
খালে বিলে ঘাসে ঘাসে লেখা যেই বিদায়ের গান,
বেদনার সঙ্গী, তুমি দেশ নও মাটি নও তুমি।

তাই এই কবিতার শেষে সেই দেশ 'বাল্যসহচর' থেকে 'বেদনার সঙ্গী'-র স্তর পেরিয়ে শুধু 'মানচিত্ররেখা' হয়ে ওঠে। অতীতের উদ্দাম শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি সব ভিড় করে আছে বুকের মধ্যে, স্মৃতিতে জাগরূক 'ঝুরি-নামানো সন্ধ্যাবেলা', নদীর ঢেউয়ের ছলাৎছল শব্দ। কবিতায় উঠে আসে সেই শব্দচিত্র :

পা- ডোবানো অলস জল, এখন আমায় মনে পড়ে?
কোথায় চলে গিয়েছিলাম ঝুরি-নামানো সন্ধ্যাবেলা ?
... ...
কিন্তু কোথায় গিয়েছিলাম? মাঝি, আমার বাংলাদেশের
ছলাৎছল শব্দ গেল অনেক দূরে মিলিয়ে, সেই

শব্দকুহক, নৌকাকাঙাল, খোলা আজান বাংলাদেশের
কিছুই হাতে তুলে দাওনি, বিদায় করে দিয়েছ, সেই

স্মৃতি আমার শহর, আমার এলোমেলো হাতের খেলা,
তোমায় আমি বুকের ভিতর নিইনি কেন রাত্রিবেলা ?
('অলস জল' : " নিহিত পাতালছায়া")

ভাঙা দেশের, ছিন্ন কৈশোরের দুর্গাপুজোর স্মৃতি উঠে আসে যেমন কিশোর নীলুর স্মৃতিতে তেমনি উঠে আসে তা কবিতায় :

যাই ছায়াময় ভিড়ে মহানিশি আরতির ধোঁয়া
দোলে স্মৃতি দোলে দেশ দোলে ধুনুচির অন্ধকার

মঠের কিনার ঘিরে কেঁপে ওঠা বনবাসী হাওয়া
যাই পিতৃপুরুষের প্রদীপ-বসানো দুঃখ, আর
ঠাকুমা যেমন ঠিক দশমীর চোখে দেখে জল
যাই পাকা সুপুরির রঙে-ধরা গোধূলির দেশ
আমি যাই ('দশমী : "তুমি তো তেমন গৌরী নও")

আরও অনেকের মতো ছিন্নমূল মানুষ হয়ে এপারে চলে এলেও নিত্যবহমান জীবনের বর্তমানের মধ্যেও বয়ে যায় অতীতের স্মৃতি যার ভিতরে বাসা বেঁধে আছে তাঁর ফেলে আসা গ্রাম, সেখানের অগণন মুহূর্তের ছবি। আছে শিশির-ঝরা জ্যোৎস্নারাত্রি, গাজনের ঢাকের শব্দ, ভোররাতে বন্ধুদের সঙ্গে নদীর পাড়ে পৌঁছে যাওয়া, অন্ধকারের আবছায়ায় জেলেনৌকোর লণ্ঠনের আলো আর নৌকোর পাটাতনে জড়ো করা ইলিশের রাশি। বাল্যের এইসব স্মৃতি মুছে যায়নি, তাই সময় থেকে সময়ান্তরে নানা কবিতায়, ছড়ায় অনুষঙ্গগুলি ফিরে ফিরে আসে। যেমন:

খুব দূর থেকে গড়িয়ে আসে ঢাকের শব্দ
এখন রাতদুপুর

সপ্তর্ষির দিকে উড়ে যায় শহরের ঘর
চোখের পাতায় বইতে থাকে খাল, খালের পাশে শ্যাওলাজমা মঠ
নেমে আসার জমি
যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা তালসুপুরি
....
ঘুমের মধ্যে হাত বাড়িয়ে রাখে কেবল দূরের
মাটি, আমার বিলীয়মান মাটি---
বেজে উঠল হাজার কাঠির ঢাক।

('বেজে উঠল ঢাক' : "বাবরের প্রার্থনা")

"সুপুরিবনের সারি" আর "সকালবেলার আলো"--এই দুটি উপন্যাসে ঘুরে-ফিরে এসেছে বাস্তুচ্যুত হওয়ার যন্ত্রণার নানা টুকরো টুকরো স্মৃতি। নীলুর বড়োমামা তাঁর বাবা অর্থাৎ নীলুর দাদুকে ঝোঝাতে থাকেন সেই দেশটা আর নিজেদের নেই। তার জবাবে বাবা ছেলেকে উত্তর দেন : '... নিজের দেশটা কি রাতারাতি অন্যের দেশ হয়ে যায়...? হতে পারে কখনো?' নীলুর দাদু শুধু নন এমন অবিশ্বাসে, সংশয়ে দোলায়িত হয়েছে অসংখ্য মানুষ। আর নীলুর সেজোমামা যখন তাকে 'কলকাতার মধ্যেই গোটা গ্রামটাকে দেখতে পাওয়ার কথা' বলেছেন তখন নীলু উত্তরে অকপটে জানিয়েছে '...খালটাকে তো আর পাবে না সেখানে। আর পুকুর? আর ওই যে ঝুমকো জবা, স্থলপদ্ম, শিউলিফুলের গাছগুলি? সেগুলি পাবে কোথায়?' যে মানুষের প্রাণের স্পন্দনে মিশে থাকে প্রিয় দেশ, তার মাটি, সেই ভালোবাসা নিয়ত 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ'-এ উপলব্ধি করা যায়। তাঁর ওই নামের বইটিতে চৌষট্টি-টি চতুষ্কের মধ্যে কয়েকটিতে উঠে আসে ফেলে আসা সময় যা অনন্ত, মনুষ্যজীবনের আদি থেকে অন্তে অন্তরালে বিস্তৃত থাকে :

১

পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ, রক্তে জল ছলছল করে
নৌকোর গলুই ভেঙে উঠে আসে কৃষ্ণা প্রতিপদ
জলজ গুল্মের ভারে ভরে আছে সমস্ত শরীর
আমার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই কোনোখানে।

৩৩

শিকড়, ব্যথিত শিরা, মানুষের অতল উৎসার
এর ওর মুখে এত ভাঙা ছবি সাজিয়ে রেখেছ !

জানো না আমিও ঠিক সেইভাবে চেয়েছি তোমাকে
মাটিকে আঙুল দিয়ে খুঁড়ে ধরে যেভাবে এ বট।

বাইরের পৃথিবীতে সারাজীবনের জন্য বিছিন্নতা ঘটে গেলেও অন্তরালে তা বটের শিকড়ের মতোই কবিকে জড়িয়ে আছে আর তাকে আঁকড়ে আছে আঙুলের অদৃশ্য মুঠি, বুকের গোপন আয়নায় নানা ভাঙা মুখের ছবির কোলাজ। কবির মুখেই আমরা শুনতে পাই এমন কথা : 'এই শূন্য আর প্রত্যক্ষ, পদ্মা আর কলকাতা, কৈশোর আর যৌবন এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়; আর এই সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে জীবন। অথবা কবিতা। 'তাই উত্তরজীবনে 'শহরপথের ধুলো'-য় তাঁর পা ধূলিধূসরিত হলেও বুকের আড়ালে ঢেউ তুলেছে পদ্মাতীরের শান্ত নীরবতা। সে টান এত গভীর যে " তুমি তো তেমন গৌরী নও" কাব্যগ্রন্থে 'আরুণি উদ্দালক' এবং 'জাবাল সত্যকাম'-এর মতো পুরাণের আধারে রূপকাশ্রিত দুটি কবিতার দীর্ঘশরীরেও উঠে আসে কবির বাল্যের স্মৃতি, ছিন্নমূলের বেদনা। দেশচেতনা ও ঐতিহ্যচেতনার থেকে ব্যক্তিগত ভরবিন্দুকে আলাদা করা যায় না। যেমন :

১. মুহূর্তের তুড়ি লেগে উড়ে যায় সমূহ সংসার
কেননা দেশের মূর্তি
কেননা দেশের মূর্তি দেশের ভিতরে নেই আর
('আরুণি ও উদ্দালক')

২. কেন চাও আত্মপরিচয়?
কোথায় আমার দেশ কোন্ স্থিতি মৃত্তিকার কুল
কোন্ চোখে চোখ রেখে বুকের আকাশ ভরে মেঘে
দেশ দেশান্তর কাল কালান্তর কোথায় আমার ঘর
তুমি চাও গোত্রপরিচয় ! ('জাবাল সত্যকাম)

তাঁর উপন্যাস দুটি একটি বালকের চোখ দিয়ে দেখা। স্মৃতিকথনে অনেক কিছু টুকরো অভিজ্ঞতার ছবিও পাই। দুর্গাপুজোর সময় প্রতিমা বিসর্জনের পর বন্ধু হারুনের নীলুর মেজোমামির ধমক খেয়ে ভয়ে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে নেমে আসা, আবার সেদিনই আচমকা সাঁতার না-জানা নীলুর পা ফসকে পুকুরজলে পড়ে যাওয়া আর সেই হারুনেরই জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে তাকে বাঁচানো। কিন্তু তার পরের বছর সেই হারুনের মুখেই যে কথাগুলো নীলু শুনেছিল তাতে তার ভীষণ রাগ হয়েছিল। বড়োদের মুখে শুনতে-পাওয়া কথাগুলিই বন্ধু হারুন তাকে বলেছিল :

> এইসব একদিন আমাগো হইয়া যাইবে ... কায়েদে আজম কইছে, এইসব আমরাই পামু... আমরা মানে মোছলমানেরা ... আমার এক চাচায় থাকে বইশ্ শালে, হেই চাচায় কইছে...
>
> সেই হারুনেরা আর অনান্য সাথীরা আগের মতো নীলুদের পুজাবাড়িতে আসে না। তার বুক চিরে বসে যায় বন্ধু হারুনের জবাব :
>
> হারুন বলল : 'আসবেও না আর। না আইল তো না আইল বইয়্যা গেল। এয়্যা তো আর তোগো দ্যাশ না, তোরা তো অ্যাহন অইন্য দ্যাশের লোক।

এই 'আমাগো-তোগো' ভাগ আর কোনোদিন মিটল না, সম্প্রীতির সেতুটা গেল ভেঙে

দেশবিভাজনকারীদের পাশাখেলায়। শঙ্খ ঘোষের লেখার পাঠকদের মনে পড়ে যেতে পারে "সুপুরিবনের সারি" উপন্যাসের শুরুতে নীলুর পুজোর ছুটিতে তাদের দেশে ফেরার কথা। স্টিমারে চেপে ফিরতে-থাকা নীলুর দেওয়া নদীপথের বর্ণনার সঙ্গে, অনুভূতির সঙ্গে মিল পাওয়া যায় অনেক পরে লেখা কবিতার :

সমান কালো হয়ে মিশে আছে মেঘনা আর আকাশ।
অনেকদিন পর
এই তোমার ফিরে আসার রাত।

ধক ধক জল কাটছে স্টিমার
আরেকবার বাঁক নিলেই
দূরে ওই সারি সারি ঘাটের আলোয় চাঁদপুরের ডক।
... ...
পায়ে শিথিল মন্থরতা, টিনের চালে অনিশ্চয়
নিশ্বাসে নিশ্বাসে
মাটির উপর ফিরে আসার মিশে যাওয়ার ঘ্রাণ।
('ফেরা': "প্রহরজোড়া ত্রিতাল")

এমনই 'হাজার হাজার বর্শা ছেঁড়া পালকের গন্ধে ভরা' স্মৃতি ঘুরে- ফিরে আসে তাঁর কবিতায়। কবিতা থেকে ছড়ায়, যাওয়ার আগে আমরা দেখে নিতে পারি আড়ালে বহমান সেই যন্ত্রণার স্রোত উত্তরকালের কবিতা এমনকী সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত লেখা (২০১২-২০২০ খ্রি.)প্রকাশিত কবিতাতেও রয়ে গেছে। আমরা কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের কবিতার দিকে তাকাতে পারি :

১. কে একা নিঃসঙ্গ বসে জল ঝরায় চোখে ?
মানুষ মানুষ তবু মানুষেরই কাছে এসে যায়
কলকাতা - ঢাকায়
নিত্যসেতুপথ বেয়ে -এপার-ওপার
এক নূরলদীন গেলে হাজার হাজার নূরলদীন
জেগে ওঠে এ-মাটিতে, কথা হয়, কথা
তোমার আনন্দ শুধু ভাষার আনন্দে ভেসে ওঠা
('কথা হবে' : 'এও এক ব্যথা উপশম')

২ ...যতটা এসেছ তার নিজস্ব পথের চিহ্ন নেই।
আছে শুধু দিব্যদান এখানে-সেখানে স্থির হয়ে
কয়েকটি নারকেলগাছ সারি সারি ঝালর ঝোলানো।
যে-কোনো ঝালরে তার সাড়া দেওয়া গোপন শৈশব--
এই যদি শেষ হতো, সমে এসে মিশে যেত সব !
('সমে এসে': " শুনি শুধু নীরব চিৎকার")

৩. ... নীচে নৌকো বয়ে যায় খাল থেকে খালের ভিতরে
দুজনার স্তব্ধতাকে বয়ে নিয়ে, আরো বয়ে নিয়ে
সন্ধিমুখে এসে জানে এখানে নদীর জলও নোনা।

দৃষ্টিপাত মনে হয় ক্ষীণবৃষ্টিবিন্দুর মতন--
হয়তো এবারই শেষ, আর কোনোদিনই আসব না।
('ভ্রমণ' : "প্রতি প্রশ্নে কেঁপে ওঠে ভিটে")

৪. ঘুম ভাঙেনি এখনও ? ওঠ্ ওঠ্। এভাবেই চলে যেতে হবে।
কোথায় ? তা জানি না। জানবার দরকারও বড়ো নেই।
শুধু জানি, যেতে হবে। তা ছাড়া, এখনই।
... ...
তা ছাড়াও, চেয়ে দেখ, আমরা তো একাই নই
সামনেও হাজারে হাজারে লোক দৃষ্টিহীন হেঁটে যাচ্ছে
ঠিকানাখোঁজার অভিযানে।
উঠে পড়, চল্ ...
('ঠিকানা' সীমান্তবিহীন দেশে দেশে)

বাল্যস্মৃতির সূত্রেই বার বার দেশভাগজনিত কবিহৃদয়ের যন্ত্রণা নানা সময়ে লেখা কবিতায় যেমন উঠে এসেছে তেমনি এসেছে নানা সময়ে লেখা ছড়াগুলিতে। সেই ছড়াগুলি নিছক শিশু-কিশোরদের আনন্দদানের জন্যই নয়, তার অনেকগুলির আড়ালেই লুকিয়ে আছে দেশ ছেড়ে চলে আসার যন্ত্রণা, ফেলে-আসা জীবনের অমলিন স্মৃতি। এই স্মৃতিরেখা প্রলম্বিত হয়ে আছে আজীবন। পঞ্চাশের দশকের যে সব কবি দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন তখন তাঁদের শৈশব নয়তো কৈশোরকাল। সেই কারণে বেশির ভাগ কবিতায় দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিঘাতের ছায়াপাত ঘটেনি, বেদনার উৎসার ঘটেছে কবিতায় স্মৃতির অনুষঙ্গে। কয়েকটি ছড়ার দিকে তাকালে কবি শঙ্খ ঘোষেরও যন্ত্রণার গোপন ক্ষতচিহ্নগুলি খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন :

১ . ... আমার নদী রইল দূরে
আমি কেবল দিনদুপুরে
চোখে অগাধ তৃষ্ণা নিয়ে ঘুরি
কোনখানে সেই চোদ্দ প্রদীপ
কোন্ তমসা করছে জরিপ
শ্বাস ফেলছে কোথায় তালসুপুরি ।
এখন আমার ইচ্ছে করে
জল দিই ফের সেই শেকড়ে
একটি যাতে স্থলপদ্ম ফোটে ...
('স্থলপদ্ম' : " বড়ো হওয়া খুব ভুল')

২. আমার ছিল পদ্মায় ভোর, বৈঁচিবনের বিকেল
তুমি কি আর সেসব কিছু পাও?
সোনারূপোর বদলে আজ দিচ্ছি কেবল নিকেল
ঘরের থেকে বেরোও না এক পা-ও !

আমার ছিল বর্ষা-অঝোর বৃষ্টিপড়ার দিনে
মাঠের মধ্যে ভিজে যাওয়ার সুখ
আমার ছিল নৌকো থেকে জোড়া ইলিশ কিনে
মায়ের মুখে জাগানো কৌতুক।

('সংঘাত' : 'বড়ো হওয়া খুব ভুল')

এই যন্ত্রণা, আবার কখনো আনন্দ-ঘেরা স্মৃতি সারাজীবন কবি-মানুষটির বুকের ঘরে বসত করে থাকে। সেই আত্মজীবনের নানা টুকরো ঘটনা, মুহূর্ত উপন্যাসের আধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেইসব দিনের সূক্ষ্ম অনুভবগুলি ছড়ার ছন্দেও উঠে আসে যেগুলি চিরকালের :

আমরা যখন ছোটো ছিলাম কতই বয়স হবে---
কেউ-বা ছিলাম কৈশোরে কেউ নিতান্ত শৈশবে
পুজোর ছুটির শেষে যখন দেশের বাড়ির থেকে
খাল পেরিয়ে নৌকো যেত নদীর দিকে বেঁকে
আমরা কেউ-বা ছইয়ের ওপর কেউ-বা পাটাতনে
বসে বসে ভেবে যেতাম, কোন্ খানে কোন্ কোণে
রইল পড়ে টান আমাদের রইল পড়ে প্রাণ ...

('পানসুপুরি' : "বড়ো হওয়া খুব ভুল")

প্রতিটি ছিন্নমূল মানুষের মধ্যেই আছে এক অবরুদ্ধ যন্ত্রণা, নিজের বসতবাটি,বাস্তু থেকে চিরকালীন নির্বাসনের সমাধানহীন অবস্থানকে বাধ্যত মেনে নিয়ে অন্যত্র বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দেওয়ার। যে মানুষ এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে না গেছে সে ছাড়া এই বেদনাকে অনুভব করা খুব সহজ নয়। নিজের সেই বাস্তুভিটে কবিও সারাজীবনের মতো ভুলতে পারেন নি। ১৯৯৯-এ কবির লেখা ভ্রমণকাহিনি 'বাংলাদেশের জলে' লেখাটির 'সন্ধ্যা ১৯৯৭' নামের অংশটিতে আছে পঞ্চাশ বছর পরে নিজের গ্রামে যাওয়ার আবেগমাখা বর্ণনা তবে সে যাত্রা একেবারেই অন্যরকম কেন না এই প্রথম জলপথে নয়, স্থলপথে পাকা রাস্তা ধরে মোটরগাড়িতে যাওয়া। পঞ্চাশ বছর পরে সেই বাড়ি চোখে দেখলেও তা মনের মাঝে চিরকালের জন্য বেঁচেই আছে :

সহজেই তুমি ভুলে থাক,তবু
আমি তো ভুলিনি তোমায়
তোমার ছবিই থেকে গেছে সব
পথের পরিক্রমায়। ('বাড়ি' : "বড়ো হওয়া খুব ভুল")

সেই ছড়ায় আছে ফেলে-আসা বাস্তুর প্রতি এমন নিভৃত উচ্চারণ ' সেই বাড়ি, সেই তুমি / অমোঘ জন্মভূমি-'। বহু বছর আগে সেই বাড়ি ছেড়ে চলে এলেও তার ছবি মুছে যায়নি! সেই বাড়ির সিঁড়ির কোণে আজও সেই বালকটি যেন লুকিয়ে থাকার আনন্দ অনুভব করে। তাই ছড়ার শেষে দেখি সেই বাড়ি সম্পর্কে ছড়াকার এমন লেখেন:

সেই সিঁড়ি, সেই বাড়ি
আজও হবে কাণ্ডারি
আজও যে আমার মনে পড়ে তার
সুপুরিবনের সারি।

এই পুনরাবৃত্তির এষণা তাঁর লেখায় ঘুরে-ফিরে আসে। একটি সাক্ষাৎকারে কবি বলেছিলেন : '...বিভাজনের স্মৃতি আর সেই সূত্রে গ্রামশহরে ধাক্কা দেওয়া সম্পর্ক, অনেকসময়েই ফিরে ফিরে আসে আমার লেখায় ! তা বোধ হয় বলাই যায়।' (দ্র. "কথার পিঠে কথা" : শঙ্খ ঘোষ, পৃ.১১৫ ; 'দে'জ পাবলিশিং, ২০১১)। ছোটোদের জন্যে লেখা কবিতা-ছড়া-উপন্যাসে নিজের শৈশবে দেখা গ্রাম-প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে-থাকা নানা স্মৃতি, মানুষজন সেই শৈশব থেকে কৈশোরের মানসিক আবর্তনের কারণ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা এমন : 'এর একটা কারণ হয়তো এই যে সাত থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত ওই বয়সটাই যে-কোনো মানুষের মনের ভিতটা তৈরি করে দেয়, তার পরে যা গড়ে উঠতে থাকে সে কেবল উপরিতল।' (তদেব, পৃ. ১৫৮)। তাই হয়তো পদ্মাপারের সজল আবেষ্টনে ঘিরে-থাকা এক সংবেদনশীল বালকের জীবনস্মৃতির অংশ মিলেমিশে যায় উত্তরকালের বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট এক কবির কবিতাবলির নানা কবিতায়।

স্মৃতির পিছুটান কাটানো খুব সহজ নয়। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় এমন হাজার স্মৃতির মধ্যে আছে এক 'চতুর্দশীর অন্ধকার' যে রাতে জন্ম হয় সারাজীবনের মতো না-মুছতে পারা এক মুহূর্তের : 'সবাই আমার মুখ দেখে না আমি সবার মুখ দেখি না/ তবু তোমার মঠ ছেড়ে যাই না/ চতুর্দশীর অন্ধকারে তোমার বুকে আগুন দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি /একা/এইখানে চুপ করে এইখানে ডোবা পেরিয়ে ঝুমকাফুলের মাঝখানে/ ঠাকুরদার মঠ।' "আদিম লতাগুল্মময়"(১৯৭২) কাব্যগ্রন্থে সংকলিত এই কবিতাটির নাম 'ঠাকুরদার মঠ'। জীবনের বৃত্ত থেকে প্রিয় মানুষগুলো বাইরের দিক থেকে মুছে গেলেও জন্মদাগের মতো আমৃত্যু ভিতরে থেকে যায়। বহুকাল পরে লেখা "বড়ো হওয়া খুব ভুল"(২০০২) ছড়ার বইটিতেও 'ঠাকুরদাদার মঠ' নামে একটি ছড়া আছে। সেই রচনাতেও আছে অন্ধকারের কথা যে অন্ধকারে কবি জ্বালতে চান একটি প্রদীপ। এই পৃথিবীতে কেটে গেছে 'কত বছর, কত-না মাস, দিন' কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষার পূরণ বাহ্যিকভাবে না ঘটলেও সেই চাওয়ার নিবৃত্তি ঘটে মনের মধ্যে। তাই ছড়াটির শেষে এমন বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা ঘটে :

বাইরে যতই কুজ্ঝটিকা
দুই চোখে হোক দিব্য শিখা
বুকের মধ্যে ঠাকুরদাদার মঠ।

দেশবিভাজন শঙ্খ ঘোষের কবিতায় এক 'স্মৃতির চালচিত্র' যা অনুভব করা যায়। একটি সংবেদী মনে যৌথ পরিবারের ভাঙনের বেদনা, নানা ঘটনা উপন্যাসে একটি কিশোরের কথনে তিনি বর্ণনা করেন, যে বয়সে তিনি দেশ ছেড়ে চলে আসেন। ওই বালক নীলমাধব বা নীলুর মনে আছে এক পাসপোর্ট যা সরকারি অভিবাসনের নিয়মের বাইরে। ওই বালক নীলু-র 'আমি' তাই অতীত নয়, বর্তমানও। নীলু যখন শেষবারের মতো দেশ ছেড়ে চলে এসেছিল তখন তার বন্ধু হারুন তাকে বলেছিল 'এই যে, আমি নীলাই। এ-যে রে ! আসিস কিন্তু আবার, সামনের বার। আসবি তো? কীরে, আসবি তো? আসিস আবার। আসবি।' ফিরে আসার নিরন্তর এই আহ্বান দেশ-কাল-সময় পেরিয়ে ফিরে আসার ডাক। অথচ বাস্তবে দাঙ্গায় দাঙ্গায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে সম্প্রীতির চেহারা, রাজনীতির কূটকৌশলে দ্বিখণ্ডিত একটা গোটা দেশ। কিন্তু মানুষ কী ভাবে, কত সরলমনে ভাবে তার পরিচয় পান কবি পঞ্চাশ বছর পরে নিজেদের গ্রামে

ভিটে দেখতে গিয়ে পথচলতি এক মানুষ হজরত আলি মিঞা-র সংলাপে :

> 'নিজের গ্রাম ছাইড়্যা দূরে আছেন ক্যান? এইটা কি ঠিক? চইল্যা আসেন। আইলে আমাগোও ভালো, আপনাগোও ভাল। কেমন ফাঁকা ফাঁকা দেখেন না গ্রামটা? আইবেন তো?' ('বাংলাদেশের জলে' : 'ইছামতীর মশা', ২০০২ ; পৃ. ৯৬, স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী)।

এই প্রশ্ন, আহ্বান ইতিহাসকে পেরিয়ে, কাঁটাতারের সীমানাকে পেরিয়ে যাওয়ার ডাক, যে ডাক দেশকাল নিরপেক্ষ মানবমন প্রত্যাশা করে। স্বাধীনতার পর এ-পার বাংলায় চলে-আসা নীলু তখনও ভেবেছে–

> 'সুন্দর একটা দেশ হবে তাদের ! কারো কোনো কষ্ট থাকবে না সেখানে। সবাই সবাইকে ভালোবাসবে, এমন সেই দেশ। আর দেশের ওই ভেঙে-যাওয়াটা? না, না, সে-ভাঙা তো থাকতেই পারে না চিরদিন। তা কি কখনো হয় না কি? দেখবে সবাই, কদিন পরে ঠিক -ঠিক আবার জুড়ে যাবে সব, ম্যাপটা আবার পুরোনো মতন হবে।" ('শহরপথের ধুলো', অরুণা প্রকাশনী, ২০১০, পৃ.৭৮)

না, নীলুর সেই স্বপ্নকে মনের গভীরে লালনই করতে হয়েছে, ভাঙা দেশ জুড়ে যাওয়ার ভাবনায় সেদিনের নীলু আর আজকের হজরত আলি মিঞার চাওয়া মিলেমিশে বাস্তবের ভাঙা দেশ মনের আড়ালে চিরকালের জন্য একটা গোটা দেশ হয়ে ওঠে যেখানে থাকে না কোনো কাঁটাতারের সীমানা।